ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1921-1927
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.416

আবুল বাশারের ‘তেলেগ দাসরি’: লোকায়ত মরমীবাদ, প্রাচ্য পুরাণ ও মানবিক আধ্যাত্মিকতার তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

নাসিরুদ্দিন হোসেন, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper attempts a close theoretical analysis of the spiritual, psychological, and sociological dimensions of Teleg Dasari by Abul Bashar, one of the most original voices in contemporary Bengali fiction. The central objective of the study is to explore how the author, through the framework of folk tradition, critically examines the moral decay of urban life and the self-centeredness of the middle class within a mystical and humane context.

At the core of the discussion lies the psychological transformation of the protagonist Surajit and the symbolic significance of his daughter Tinki’s dream, which invokes the timeless mystical philosophy of Abou Ben Adhem by Leigh Hunt. The analysis demonstrates that Abul Bashar transcends the artificial boundaries of institutional religion and establishes selfless love for humanity as the sole criterion of true spirituality.

Drawing upon Eastern mythology, particularly the tradition of the South Indian Dasari—a community of wandering mystic ascetics known for their renunciation—the author relocates this ethos within the harsh and unforgiving winter of Kolkata. Here, winter emerges not merely as a season but as a metaphor for mechanical existence, emotional numbness, and social indifference in modern civilization.

The paper further examines how the presence of humanitarian figures such as Mother Teresa and the Sufi concept of khidmat-e-khalq (service to humanity) are integrated into a coherent philosophical framework. Ultimately, the study argues that true liberation lies in shedding the comfort of individual luxury and embracing collective human responsibility.

This confluence of folk mysticism, Eastern mythology, and humanistic spirituality elevates Teleg Dasari beyond a mere short story, positioning it as a profound spiritual manifesto for twenty-first-century urban life. The narrative reminds us that the most sacred place of worship is not the temple or mosque, but the suffering heart of humanity.

Keywords: Abul Bashar’s Fiction, Teleg Dasari, Eastern Mythology, Folk Mysticism,Abou Ben Adhem, Humanistic Spirituality,Winter as Metaphor, Social Responsibility

আবুল বাশারের ফিকশন বাংলা সাহিত্যের ধারায় এক স্বতন্ত্র ও বৈপ্লবিক ঘরানার জন্ম দিয়েছে যেখানে মাটির গভীর থেকে উঠে আসা লৌকিকতা আর উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিকতা এক অনিবার্য বিন্দুতে মিলিত হয়। তাঁর

রচনায় সবসময়ই দেখা যায় সমাজের প্রান্তিক ও ব্রাত্য মানুষের যাপিত জীবনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অলৌকিক প্রশান্তি বা দহনের এক জীবন্ত চালচিত্র। ১৯৮৯ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তেলেগ দাসরি' গল্পেও বাশার সাহেব এই চিরকালীন বৈশিষ্ট্যকে এক নতুন তাত্ত্বিক মাত্রায় উন্নীত করেছেন। তিনি যখন কোনো আখ্যান নির্মাণ করেন, তখন কেবল চরিত্রগুলোর বাহ্যিক কর্মকাণ্ড বা সংলাপের ওপর আলোকপাত করেন না, বরং তাদের অবচেতন মনের গভীর অলিগলি খনন করেন যা অনেক সময় পাঠককে এক ধরণের অস্তিত্ববাদী সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাঁর ফিকশনে আধুনিক নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা, স্বার্থপরতা আর কৃত্রিমতার বিপরীতে আদিম সারল্য ও মরমী চেতনার এক নিরন্তর সংঘাত ফুটে ওঠে। গল্পে সুরজিতের মতো এক মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক আসলে সমকালীন সমাজের সেই সংকীর্ণতাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তুলে ধরেছেন যা আমাদের চারপাশের মানুষের দুঃখ-বেদনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বাশার সাহেবের ফিকশন কেবল গল্প বলা নয়, এটি আসলে এক ধরণের সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান যেখানে মানুষের আদিম আবেগগুলো ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক প্রলেপ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে এবং এক বিশ্বজনীন সত্যের সন্ধান দেয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন লেখক হিসেবে তাঁর দায়বদ্ধতা কেবল সমাজের উপরিভাগের সচ্ছলতার বর্ণনায় নয়, বরং সেই সব মানুষের কথা বলায় যারা ইতিহাসের পাতায় ব্রাত্য হয়ে থাকে কিন্তু যাদের হৃদয়ে বাস করে জগতের গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্য। আবুল বাশারের রচনায় ব্যবহৃত ভাষা, প্রতীক ও অলঙ্কার পাঠককে সরাসরি এক আদিম অনুভবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যা এই গল্পটিকে কেবল একটি ফিকশন হিসেবে নয়, বরং একটি তাত্ত্বিক দস্তাবেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'তেলেগ দাসরি' শব্দবন্ধটি এই গল্পের প্রাণভোমরা এবং এটি একটি গভীর ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে উৎসারিত যা গল্পটিকে সাধারণ আখ্যানের সীমা ছাড়িয়ে এক বিশেষ উচ্চতা দান করেছে। মূলত তেলেগ দাসরি (Telega Dasari) নামে পরিচিত একটি ভক্তিমূলক ও সামাজিক সম্প্রদায় প্রধানত দক্ষিণ ভারতের তেলুগুভাষী অঞ্চলে গড়ে ওঠে এবং ঐতিহাসিকভাবে বৈষ্ণব ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। দাসরি শব্দটির মূল অর্থ ভগবানের দাস বা সেবক, যা বৈষ্ণব ভক্তি ধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিচয়। এই সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদেরকে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত ও সেবক হিসেবে মনে করেন এবং ঐতিহ্যগতভাবে তারা ভজন-কীর্তন, পুরাণপাঠ, ধর্মীয় উপদেশ এবং মন্দিরসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে দাসরিরা অনেক সময় ঘুরে ঘুরে ভক্তিমূলক গান গাইত, পুরাণের গল্প বলত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তুলত। তেলেগ দাসরি নামটির তেলেগ বা তেলেগা অংশটি তেলুগুভাষী জনগোষ্ঠীর পরিচয় নির্দেশ করে, ফলে এই সম্প্রদায় মূলত তেলুগু সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিকভাবে এদের বসবাসের প্রধান অঞ্চল ছিল বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা। গল্পে তেলেগ দাসরিদের সম্পর্কে সুরজিতের বক্তব্য- "অন্ধ্রের এক দলিত ছোটো জাত এরা। তেলেগু একটা গল্পে এদের কথা পড়েছি আমি। এরা গান করে। রাজারাজড়ার শৌর্যবীর্যের গাঁথা ঢোল বাজিয়ে গায়।"[১] তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিছু অংশ পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও চলে আসে এবং আজ কিছু পরিবার পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িষ্যা এলাকায়ও বসবাস করে। গল্পে সুরজিতের বক্তব্যে তাদের কলকাতায় (পশ্চিমবঙ্গ) আসবার বিষয়টি স্পষ্ট হয়,"এরা কলকাতায় এল কী করে তাই ভাবছি।"[২] ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তেলেগ দাসরিরা মূলত ভগবান বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার ভেঙ্কটেশ্বর-এর ভক্ত হিসেবে পরিচিত এবং দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি অঞ্চলে ভেঙ্কটেশ্বর ভক্তির বিস্তারের সঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচ্য ধর্মীয় সাহিত্যে সরাসরি "তেলেগ দাসরি" নামটি খুব বেশি উল্লেখ না থাকলেও দাস বা ভগবানের সেবক ভক্তের ধারণা বিভিন্ন পুরাণে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে ভাগবত-এ ভক্তকে ভগবানের দাস হিসেবে বর্ণনা করা

হয়েছে এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রেম অর্জনের কথা বলা হয়েছে। একইভাবে বিষ্ণু পুরাণ-এ ভগবান বিষ্ণুর ভক্তদের ধর্মীয় কর্তব্য, কীর্তন, স্মরণ এবং সেবার মাধ্যমে ভক্তি প্রকাশের আলোচনা রয়েছে, যা দাসরি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে দেয়। সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দাসরি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আরও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় কিছু আধুনিক গ্রন্থে। উদাহরণস্বরূপ এডগার থার্স্টনের 'Castes and Tribes of Southern India' গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বর্ণনার মধ্যে 'দাসরি' সম্প্রদায়ের পেশা ও ধর্মীয় ভূমিকার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এম এ শেরিং এর 'The Tribes and Castes of the Madras Presidency' গ্রন্থেও উক্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিচয় ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এইসব উৎস থেকে বোঝা যায় যে তেলেগ দাসরিরা কেবল একটি সামাজিক গোষ্ঠী নয়, বরং তারা দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব ভক্তি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারক। তাদের ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি হলো ভক্তি, সেবা ও ধর্মীয় সংগীতের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রেম প্রচার করা, যা বহু শতাব্দী ধরে দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করে এসেছে। আবুল বাশার এই বিশেষ লোকায়ত ঐতিহ্যকে কলকাতার যান্ত্রিক ও ইট-পাথরের প্রেক্ষাপটে এক বিশাল রূপক হিসেবে স্থাপন করেছেন যা একাধারে বিস্ময়কর ও তাত্ত্বিক। গল্পে সুরজিৎ যখন তার মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপদ ও আরামদায়ক বেষ্টনী ভেঙে মধ্যরাতে হাড়কাঁপানো শীতে রাস্তার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প করে, তখন সে আর সাধারণ গৃহস্থ থাকে না, বরং সে আসলে সেই ভ্রাম্যমাণ মরমী সাধকদের আধুনিক এক উত্তরসূরি হয়ে ওঠে। "সুরজিৎ বলে- বন্দনা আমার বর্ষাতিটা দাও। একবার দেখি, বউটা কি করছে!"[৩] তাত্ত্বিকভাবে, এই সত্তায় উপনীত হওয়া মানে হলো নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব বা 'ইগো'কে বিসর্জন দিয়ে জগতের সামগ্রিক দুঃখের একনিষ্ঠ অংশীদার হওয়া। গল্পের নামকরণে এই লোকায়ত সাধকদের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে লেখক আমাদের এই সত্যটিই মনে করিয়ে দেন যে, প্রকৃত সাধনা কোনো মন্দিরে বা মঠে আবদ্ধ নয়, বরং তা রাজপথের ধুলোয় সাধারণ মানুষের সেবায় নিহিত। এই সাধকেরা যেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুশাসন বা গোঁড়ামি মানতেন না, বরং প্রেম ও দয়াকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। সবক্ষেত্রেই টিংকি, কখনো সুরজিৎ আবার কখনো বন্দনার কর্মকাণ্ডেও সেই একই বিশ্বজনীন মরমী সুর ধ্বনিত হয়েছে। বাশার সাহেব অত্যন্ত নিপুণভাবে এই গ্রামীণ ও আদিম লোকায়ত উপাদানকে আধুনিক শহরের কংক্রিট জীবনের নৈতিক সংকটের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, যা পাঠককে এক ধরণের সাংস্কৃতিক নস্টালজিয়া ও তীব্র নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

প্রাচ্য পুরাণ এই আখ্যানের পরতে পরতে এমনভাবে মিশে আছে যে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব এবং এটি গল্পের কাহিনীকে এক অনন্য গাম্ভীর্যতা দান করেছে। প্রাচ্য দর্শনে বিশেষ করে ভারতবর্ষীয় পুরাণসমূহ এবং লোকগাথায় দেবতা ও মানুষের যে সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে, তা অনেক সময় পারস্পরিক দয়া, ত্যাগ এবং নৈতিক পরীক্ষার ভিত্তিতে রচিত। অনেক পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা দেখি যে, দেবতারা বিভিন্ন ছদ্মবেশে মানুষের দ্বারে আসেন তাদের কর্মফল ও হৃদয়ের ঔদার্য পরীক্ষা করতে। 'তেলেগ দাসরি' গল্পে টিংকির স্বপ্নে আসা সেই দেবদূতটি আসলে সেই প্রাচ্য পুরাণের অলৌকিক বার্তাবাহক যারা মানুষকে তাদের প্রকৃত স্বরূপ মনে করিয়ে দিতে পৃথিবীতে আগমন করে।– "টিংকি ডাবরের ঝিলিক দেখে অবাক হল। এমনই আলোয় ঝলমল করছিল রাতের দেবদূত।"[৪] প্রাচ্য পুরাণে দান বা ত্যাগকে কেবল পুণ্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয় না, বরং একে দেখা হয় মহাজাগতিক ভারসাম্য রক্ষার একটি আবশ্যিক পথ হিসেবে। সুরজিতের স্ত্রী বন্দনা যখন সুরজিতের উপর রাগ করে তার ঘরের বহুমূল্য ও উষ্ণ লেপটি শীতে মেঝেয় শুয়ে কাঁপতে থাকা এক ভামিনীর গায়ে ছুঁড়ে দেয়, তখন সেই দৃশ্যটি কোনো প্রাচীন পৌরাণিক ত্যাগের মাহাত্ম্যের চেয়ে কম মহিমান্বিত মনে হয় না। লেখক এখানে আধুনিক সময়ের মানুষকে পুরাণের

সেই আদিম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন যে, অন্যের কষ্ট লাঘব না করে নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি বা শান্তি কখনোই সম্ভব নয়। প্রাচ্য পুরাণের এই নিগূঢ় রহস্যটি লেখক অত্যন্ত সমকালীন ভঙ্গিতে সুরজিৎ ও মেয়ে টিংকির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। বাশার সাহেব এখানে পুরাণকে কেবল অতীত হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং একে এক জীবন্ত শক্তিরূপে উপস্থাপন করেছেন যা মানুষের বিবেকের রুদ্ধ দ্বার খুলে দিতে সক্ষম। এই পৌরাণিক চেতনা সুরজিতের যাত্রাটিকে এক ধরণের পুণ্যস্নানে রূপান্তর করে, যেখানে সে তার যাবতীয় স্বার্থপরতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলে।

লোকায়ত মরমীবাদ আবুল বাশারের এই রচনার মূল দার্শনিক ভিত্তি যা শাস্ত্রীয় ধর্মের কঠোরতা, আচারসর্বস্বতা ও কৃত্রিম বিভাজনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এক সহজ প্রেমের কথা বলে। মরমীবাদ বা মিস্টিকজম সবসময়ই মানুষের হৃদয়ের সাথে পরম সত্তার সরাসরি ও ব্যক্তিগত সংযোগের কথা বলে, আর লোকায়ত মরমীবাদ সেই সংযোগকে খুঁজে পায় সাধারণ শ্রমজীবী, আর্ত ও রিক্ত মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে। "শ্রীরামকৃশষ্ণ মানুষের বেদনা অনুভব করেছেন তাঁর বিশ্বপ্রসারী হৃদয়ের ব্যাকুলতায়। তাঁর বাণী বেদনার বাণী, জাগ্রত চৈতন্যেরও বাণী।"[৫] 'তেলেগ দাসরি' গল্পে আমরা দেখি মেয়ে টিংকি কোনো বিশেষ মন্ত্র বা তসবিহ হাতে নিয়ে উপাসনা করছে না, বরং তার প্রকৃত উপাসনা হলো শীতের রাতে অসহায় মানুষের হাহাকার নিজের বুকের গভীরে উপলব্ধি করা।– "টিংকি হঠাৎ ককিয়ে উঠল- ওরা কি করে বাঁচবে বাবা।"[৬] প্রথমত তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করলেও পরন্তু তাদের প্রতি তার সহানুভূতি জেগে ওঠে এবং মেয়ের কথায় কান না দিয়ে "সুরজিৎ যেন মৃদু চমকে সহসা লেপসুদ্ধ উঠে বসে কোনো কথায় শোনেনি এমন ধারা সহজ করে অন্য বিস্ময়ে প্রকাশ করল- এই রে! বৃষ্টি এল বোধ হয়। তা কী করে হয়? ঠান্ডা, এত ঠান্ডা, তারপর বৃষ্টি! বাঁচবে না। সিওর, মারা পড়বে।"[৭] লোকায়ত মরমীবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, প্রতিটি প্রাণের ভেতর সেই পরম সত্তা বা ঈশ্বর বিরাজমান, তাই আর্তের সেবা করা মানেই হলো ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা করা। সুরজিৎ এবং তার মেয়ে টিংকির মনে পরহিতৈষণার এক অনিশ্চিত যাত্রা, তা আসলে এক ধরণের সুফিবাদী বা বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শনেরই আধুনিক নাগরিক সংস্করণ। গল্পে পরোপকারের বন্দনার আপত্তি থাকলেও টিংকি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে- "- তুমিই বা কী বোঝ মা। এই ঠান্ডায় ওরা কোথায় যাবে? মা নুষ যে পিশাচ নয় তা বুঝি।"[৮] লেখক এখানে স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে উপাসনা করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ হলো মানুষের চোখের জল মোছানো এবং বিপদে পাশে দাঁড়ানো। এই মরমীবাদ কোনো তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়, এটি একটি সক্রিয় মানবিক অংশগ্রহণ। লোকায়ত মরমীবাদের এই নির্যাসটি গল্পের প্রতিটি সংলাপে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুরজিতের এবং সবক্ষেত্রেই তার মেয়ের তীব্র মানসিক দহনের মধ্যে এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, তা পাঠককেও এক ধরণের আত্মশুদ্ধির পথে নিয়ে যায়। এটি প্রমাণ করে যে, ধর্ম যখন মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে গিয়ে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়, তখন লোকায়ত মরমীবাদই তাকে আবার মাটির মানুষের কাছে ফিরিয়ে আনে।

'আবু বিন আদম' কবিতার উল্লেখ এই গল্পের কাহিনী বিন্যাসে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে কাজ করেছে যা গল্পের দার্শনিক উচ্চতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। লে হান্টের এই কবিতাটি বিশ্বসাহিত্যে মানবতার এক অমোঘ দলিল হিসেবে স্বীকৃত যেখানে কবি দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরকে ভালোবাসা আর ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষকে ভালোবাসা আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। টিংকি যখন এই কবিতাটি পাঠ করে, তখন সে আসলে এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাকে তার বাবা সুরজিতের সামনে এনে দাঁড় করায়।–

"বাবা তুমি কি ভালো মানুষ নও?"[৯] আবু বিন আদমের সেই বিখ্যাত ও বিনীত প্রার্থনা— "Write me as one that loves his fellow men"[১০] — সুরজিতের জীবনের মূলমন্ত্রে এবং তার অস্তিত্বের সংকটে পরিণত হয়। গল্পের এক পর্যায়ে সুরজিৎ নিদারুণভাবে বুঝতে পারে যে, দেবদূতের কলমে লেখা তালিকায় নাম না থাকার অর্থ হলো সে তার চারপাশের অভুক্ত ও শীতার্ত মানুষের প্রতি উদাসীন থেকে গেছে। এই কবিতাটি এখানে কেবল একটি সাহিত্যিক অনুষঙ্গ নয়, এটি সুরজিতের আমূল পরিবর্তনের প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। প্রাচ্য সুফিবাদে যেমন বলা হয় যে মানুষের হৃদয়েই আরশ-এ-আজম বা স্রষ্টার সিংহাসন, আবু বিন আদমের এই দর্শনটি সুরজিতকে সেই ধ্রুব সত্যের খুব কাছে নিয়ে যায়। লেখক অত্যন্ত সুনিপুণভাবে কবিতার পংক্তিগুলোকে সুরজিতের ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা, যান্ত্রিক জীবন এবং সামাজিক অপরাধবোধের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

মানবিক আধ্যাত্মিকতা এই গল্পের সেই কেন্দ্রীয় ও শক্তিশালী বিন্দু যা ধর্মকে অলৌকিকতার কুয়াশা থেকে বের করে এনে লোকায়ত সেবায় ও মানুষের প্রতি মমতায় প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথাগত আধ্যাত্মিকতা অনেক সময় মানুষকে ইহজগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল পরলোকের পুরস্কারের চিন্তায় মগ্ন রাখে, কিন্তু আবুল বাশার এখানে যে আধ্যাত্মিকতার প্রস্তাব করেছেন তা সরাসরি জীবন্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।– "মানুষকে ভালোবেসেছি যে ভগবানকে ডাকতে ভুলে গেছি।"[১১] সুরজিতের পা পরম যত্নে জড়িয়ে ধরে ভামিনী যখন উষ্ণতা পেতে চায়, তখন তার সেই স্পর্শ কোনো সাধারণ শারীরিক সংস্পর্শ থাকে না, তা হয়ে ওঠে এক ঐশ্বরিক করুণা ও স্বর্গীয় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। ভামিনী বলে- "বাবুর পা দু'খানি কী গরম গো! বলেই ভামিনী খাটের তলার দেবতার মতো ফর্সা পা দু'হাতে চেপে ধরে।"[১২] মানবিক আধ্যাত্মিকতার মূল কথা হলো, মানুষের ভেতরে যে সৃজনশীল, দয়ালু ও সহমর্মী সত্তা ঈশ্বরপ্রদত্ত হিসেবে আছে তাকে জাগ্রত করা। ভামিনী এখানে সুরজিতের মানবিক আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছেন লেখক এই গল্পে সপ্রমাণ দেখিয়েছেন যে, একজন মানুষ তখনই আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণতা পায় যখন সে অন্যের অভাবকে নিজের অভাব বলে মনে করতে শেখে। সুরজিতের এই যে দহন, এই যে শীতের রাতে নিরাপদ ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য এক ধরণের ব্যাকুলতা—এগুলো সবই মানবিক আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল লক্ষণ। এটি কোনো বিশেষ ধর্মীয় লেবাস পরে বা তিলক কেটে হয় না, এটি হয় এক বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ সহমর্মিতার বোধ থেকে। আবুল বাশার এই গল্পে প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক পৃথিবীতে যেখানে প্রযুক্তির চাপে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, সেখানে মানবিক আধ্যাত্মিকতাই পারে মানুষকে তার আদিম, শ্রেষ্ঠ ও দয়ালু সত্তায় পুনরায় ফিরিয়ে নিতে।

শীতের রূপক এই গল্পে এক প্রলয়ঙ্কারী ও বিচারকের মতো শক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে যা মানুষের অস্তিত্বের নগ্নতাকে এবং সমাজের বিভেদকে চরমভাবে প্রকাশ করে দেয়। লেখক যখন 'পৃথিবীর আদিমতম শীতের রাত্রি...'[১৩] শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন, তখন তিনি কেবল এক ঋতুর পরিবর্তনের কথা বলেন না, তিনি বলেন সেই অনাদ্যিকালের মানবিক বঞ্চনার ইতিহাস যা আজও মানুষকে হাড়কাঁপানো শীতে ফুটপাতে আশ্রয়হীন হয়ে শুতে বাধ্য করে। এই শীত আসলে মানুষের হৃদয়ে জমে থাকা স্বার্থপরতা ও উদাসীনতার এক বিশাল রূপক, যা আমাদের চারপাশের মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়। শীত এখানে এক ধরণের নৈতিক বিচারকের ভূমিকা পালন করে যা সুরজিতের মতো মানুষকে তাদের বিবেক জাগ্রত করতে বাধ্য করে। সুরজিতের ঘরে থাকা সেই দামী ও ভারী লেপটি হলো সেই সামাজিক বিভাজনের রূপক যা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এক অভেদ্য ও অদৃশ্য দেয়াল তুলে রাখে। শীতের প্রকোপ বাইরে যত বাড়তে থাকে, সুরজিতের ভেতরের অপরাধবোধ ও নৈতিক দহনও তত তীব্র হতে থাকে। এই শীতই শেষ পর্যন্ত

সুরজিতকে বাধ্য করে তার ঘরের নিরাপদ উষ্ণতা ও বিলাসিতা ছেড়ে এক অনিশ্চিত ও কঠিন রাস্তায় নামতে। বাশার সাহেবের বর্ণনায় শীত কেবল এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক অগ্নিপরীক্ষা যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব যাচাই করা হয়। গল্পের শেষে যখন সুরজিৎ ও তার সঙ্গীরা ফুটপাতের মানুষদের অবস্থান জানবার জন্য নিচে নেমে আসে, তখন শীতের সেই ভয়াবহ অন্ধকার যেন এক অলৌকিক মানবিক উষ্ণতা ও ভালোবাসার কাছে নতি স্বীকার করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা এই লেখনীর শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যা গল্পের কাহিনীকে একটি ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে এক মহৎ সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। সুরজিৎ কেবল একজন আধ্যাত্মিক সাধক বা স্বপ্নবিলাসী নয়, সে মূলত একজন সামাজিক জীব এবং তার এই নৈতিক জাগরণ আসলে সমাজের প্রতি তার দীর্ঘদিনের ঋণের এক বিলম্বিত স্বীকৃতি। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ যখন কেবল নিজের সুখের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে চারপাশের দারিদ্র্য ও বঞ্চনাকে সুকৌশলে অস্বীকার করে, তখন সমাজ হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব এক গভীর সংকটের মুখে পড়ে। আবুল বাশার এই গল্পের অসাধারণ বুননের মাধ্যমে আমাদের সেই চিরন্তন দায়বদ্ধতার কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সুরজিতের এই মধ্যরাতের ফুটপাত অভিযান কোনো ব্যক্তিগত শখের বা করুণার বিষয় নয়, এটি তার টিকে থাকার জন্য এক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দায়। সে গভীরভাবে বুঝতে পারে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিবেশী অনাহারে বা শীতে বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের প্রার্থনা, উপাসনা বা ব্যক্তিগত সুখ সম্পূর্ণ অর্থহীন ও মেকি। সামাজিক দায়বদ্ধতার এই প্রখর বোধটিই 'আবু বিন আদম' কবিতার আদলে শেষ পর্যন্ত সুরজিতের নাম দেবদূতের সেই পবিত্র তালিকায় লেখাতে বাধ্য করে। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত মুক্তি কখনোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, মুক্তিকে হতে হবে সামষ্টিক ও সর্বজনীন। যখন তারা সবাই মিলে নিজেদের বিলাসিতা বিসর্জন দিয়ে ফুটপাতের মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তখন এক নতুন ধরণের সামাজিক ভ্রাতৃত্বের জন্ম হয় যা যে কোনো প্রথাগত রাজনীতির চেয়েও বেশি শক্তিশালী। এই দায়বদ্ধতাই হলো সেই সঞ্জীবনী শক্তি যা একজন সাধারণ মানুষকে মহৎ ও ত্যাগের সোপানে উন্নীত করে এবং সমাজকে এক নতুন আলোর দিশা দেখায়।

আবুল বাশারের 'তেলেগ দাসরি' আখ্যানটি সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে কেবল একটি সফল সাহিত্যকর্ম নয়, বরং এটি বিজাতীয় ও যান্ত্রিক নাগরিক জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট আধুনিক মানুষের জন্য এক আধ্যাত্মিক ইশতেহার। এই গল্পের পরতে পরতে লেখক যে মানবিক দর্শনের বীজ বপন করেছেন, তা আমাদের প্রথাগত ধর্মচিন্তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন দয়া ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সুরজিতের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর এবং তার মধ্যরাতের কঠিন অভিযান প্রমাণ করে যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কোনো নির্জন গুহায় বা শাস্ত্রীয় তর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার প্রকৃত বাসভূমি হলো মানুষের আর্তনাদ আর হাহাকারের মাঝখানে। লেখক এখানে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দেখিয়েছেন যে, যখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষের চোখের জল মুছতে ব্যর্থ হয়, তখন লোকায়ত মরমীবাদ এবং প্রাচ্য পুরাণের সেই মানবিক নির্যাসই হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান অবলম্বন। শীতের সেই ভয়াবহ অন্ধকার রাতটি আসলে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরের স্বার্থপরতার প্রতীক, আর সুরজিতের ত্যাগ সেই অন্ধকার ভেদ করে আসা প্রথম ভোরের আলো। প্রবন্ধের এই পর্যায়ে এসে এটি স্পষ্ট যে, আবুল বাশার তাঁর ফিকশনের মাধ্যমে এক নতুন ধরণের 'ভক্তি আন্দোলনের' প্রস্তাবনা করেছেন। এই ভক্তি কোনো জড় মূর্তির প্রতি নয়, বরং রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষের প্রতি। তিনি প্রাচ্য পুরাণের 'দাসরি' সত্তাকে আধুনিক মহানগরের প্রেক্ষাপটে স্থাপন

করে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মনুষ্যত্বের সাধনা কোনো কালেই পুরনো হয় না। টিংকির সারল্য আর লে হান্টের 'আবু বিন আদম' কবিতার সেই চিরন্তন আবেদন যান্ত্রিক জীবনকে যেভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তা প্রতিটি সংবেদনশীল পাঠকের জন্য এক বড় ধরণের নৈতিক ধাক্কা। এই গল্পটি আমাদের এই রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমাজের এক বড় অংশ ফুটপাতে শীতে কাঁপছে বা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও অর্জিত পুণ্য আসলে এক ধরণের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। লেখকের এই কঠোর কিন্তু সত্য ইশতেহারটিই এই গল্পের চরম সার্থকতা। সাহিত্য যখন জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে মিলিয়ে দেয়, তখনই তা কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে এবং 'তেলেগ দাসরি' নিঃসন্দেহে সেই বিরল সম্মানের দাবিদার।

তথ্যসূত্র:

ক। বাশার, আবুল। শ্রেষ্ঠ গল্প। দে'জ পাবলিশিং। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ (ফাল্গুন ১৪২৯), কলকাতা, পৃ. ১৮০।

১। তদেব, পৃ. ১৯৩।

২। তদেব, পৃ. ১৯৩।

৩। তদেব, পৃ. ১৯৭।

৪। তদেব, পৃ. ১৮৫।

৫। ত্যাগিবরানন্দ, স্বামী। সুফীসাধনা ও মরমীয়া সুফী সাধক-সাধিকা। গিরিজা লাইব্রেরী, প্রকাশকাল ২০২০, ২২/সি কলেজ রো কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১১১।

৬। তদেব, পৃ. ১৯৪।

৭। তদেব, পৃ. ১৯৬।

৮। তদেব, পৃ. ১৯৩।

৯। তদেব, পৃ. ১৮২।

১০। হান্ট, লে। 'Abou Ben Adhem'। https://www.poemhunter.com/poem/abou-ben-adhem/। প্রবেশের তারিখঃ ২০ শে মার্চ ২০২৬।

১১। তদেব, পৃ. ১৮৬।

১২। তদেব, পৃ. ১৮৩।

১৩। তদেব, পৃ. ১৮০।